# কুরআনের সঙ্গে পূর্বসূরীদের সম্পর্ক

[ Bengali – বাংলা – بنغالي ]

খালেদ ইবন আবদুল্লাহ আল-মুসলিহ

৪০৩

অনুবাদ: আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

# حال السلف مع القرآن

خالد بن عبد الله المصلح

ترجمة: علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

IslamHouse.com

# সূচীপত্র

| ক্র | শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | কুরআন বড় নি'আমত | ৩ |
| ২ | কুরআন দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণ তাদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন | ৬ |
| ৩ | কুরআন আল্লাহর বাণী ও তাঁর মহান গুণ | ৬ |
| ৪ | সালাফ বা পূর্বসূরী বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে | ১০ |
| ৫ | সালাফগণ কর্তৃক কুরআনের ওপর আমলের স্বরূপ | ২০ |
| ৬ | আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কুরআন | ৩২ |
| ৭ | ইমামগণ ও কুরআন তেলাওয়াত | ৩৭ |
| ৮ | কুরআন তেলাওয়াত ও রাসূলের পদ্ধতি | ৪২ |
| ৯ | আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি | ৪৭ |
| ১০ | কুরআন তেলাওয়াত অপরের কাছ থেকে শোনা | ৫৪ |

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উম্মতের ওপর নি'আমতের শেষ নাই। কত প্রকারের কত ধরনের নি'আমতই না তিনি দান করেছেন। কোনো মানুষের পক্ষে এক বৈঠকে বা অনেকগুলো আসরে এসবের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে মানবতার ওপর এবং বিশেষভাবে এই উম্মতের ওপর সবচেয়ে বড় যে নি'আমতটি দান করেছেন তা হলো কুরআন নাযিলকরণ। আল্লাহ তা'আলা যাকে সমগ্র মানবতার জন্য নি'আমত হিসেবে দান করেছেন। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ কিতাবকে আসমানী কিতাবসমূহের পরিসমাপ্তি হিসেবে নাযিল করেছেন। এটিকে নিখিল সৃষ্টির জন্য প্রমাণ বানিয়েছেন। এটি তাই সকল নবীর নিদর্শনের শ্রেষ্ঠতম। নবীগণ যত কিতাব এনেছেন তার মহানতম। এ মহা গ্রন্থ এমন এক মু'জিযা, মহা নিদর্শন ও শ্বাশত নমুনা- যার প্রভাব কোনো যুগ বা স্থানে সীমিত নয়; বরং যতকাল দিন-

রাতের গমনাগমন অব্যাহত থাকবে এটিও ততদিন সমুজ্জ্বল থাকবে। এমনকি যখন মানুষ আর কুরআনকে গ্রহণ করবে না, এ কিতাবের প্রতি আগ্রহ থেকে তাদের অন্তর সরে যাবে এবং এ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রবণতা বাতিল হয়ে যাবে, তখন শেষ যামানায় মানুষ এ থেকে উপকৃত না হলে আল্লাহ তা'আলা একে উঠিয়ে নিবেন। কারণ, কুরআনকে কিতাবের পৃষ্ঠা ও মানুষের অন্তর থেকে তুলে নেওয়াই হবে তখন এর মর্যাদারক্ষার দাবী।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ অবতরণের সুসংবাদ দিয়েছেন। সাধারণভাবে মানব জাতির ওপর এ কিতাব নাযিলের সুসংবাদ বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧﴾ [يونس: 57]

“হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার

শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭]

এ সুসংবাদ ও বয়ানের পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলছেন,

﴿قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨﴾ [يونس: 58]

“বল, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়'। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭]

এ সুসংবাদ লাভ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন আনন্দের সঙ্গে। কিতাবুল্লাহ লাভের আনন্দ ছিল মূলত আল্লাহর নি'আমত লাভেরই আনন্দ। আল্লাহ যে তাঁকে বিশেষ এ মহা অনুগ্রহ দান করেছিলেন আনন্দটি ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরাও আমোদিত হয়েছিলেন। কারণ, কিতাব ছিল তাদের ওপর সবচেয়ে

বড় নি‘আমত। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ নি‘আমত অবতরণের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটা ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে বড় মুসীবত। কেননা এর মাধ্যমে মূলত আসমানী সাহায্যের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এই কল্যাণ এবং এই কিতাবের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। যা নিয়ে আহ্লাদিত হয়েছিলেন তাবে‘ঈগণ এবং আহ্লাদিত হয়েছেন ও হবেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদেরকে সুন্দরভাবে অনুসরণকারীগণ। যখন তারা এ থেকে মহান গুণাবলিতে ঋদ্ধ হবেন, যা মানুষের উভয় জগতের সাফল্য- দুনিয়ার সফলতা ও আখিরাতের কামিয়াবীর গ্যারান্টি দেয়। কেননা এ কিতাবের উপকারিতা শুধু সুস্থিরতার জগত তথা আখিরাত জগতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আখিরাতের আগে দুনিয়ার জীবনেও মুমিন এর সুফল পাবে। অতএব, তা এমন কিতাব যার মাধ্যমে মানুষের সব কিছু সংশোধিত হয়। এর দ্বারা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অবস্থা সুসংহত হয়। এ জন্যই আল্লাহ সাধারণভাবে সব মানুষকে এর সুসংবাদ

দিয়েছেন। এটি হিদায়াত, রহমত ও শিফা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الاسراء: 82]

“আর আমরা কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮২] এখানে মুমিনদের খাস করা হয়েছে এজন্য যে, সাধারণত তারাই এ কুরআন থেকে উপকৃত হয়। নয়তো কুরআন প্রত্যেকের জন্যই রহমতস্বরূপ। অতএব এতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। এতে আছে মানব জীবনের যাবতীয় অনুষঙ্গের সুবিন্যাস, তাদের পরকালের সুপ্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। এ জন্যই এ কিতাব এমন অনেক ব্যক্তির জ্ঞানকেও নাড়া দেয় যারা আজ অবধি ঈমান আনে নি। কারণ, এর মধ্যে এমন বর্ণনা, এমন অলৌকিকত্ব এবং এমন গূঢ় রহস্য রয়েছে যাকে কোনো জ্ঞান পরিবেষ্টন করতে পারে না। কোনো অভিব্যক্তি তাকে প্রকাশ

করতে পারে না। কোনো ভাষা যার বিবরণ দিয়ে শেষ করতে পারে না। এমন বিষয় যা বর্ণনাতীত। এমন যা কল্পনাতীত। কেনই বা নয়, এটি তো নিখিল জগতের রবের কালাম। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রজ্ঞাময় বাণীতে বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: 11]

“তার অনুরূপ কেউ নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] অতএব, আমাদের রবের মতো কেউ নেই। না তাঁর গুণাবলিতে, না তাঁর সত্ত্বায় আর না তাঁর কার্যাবলিতে। তাঁর জন্য যা ওয়াজিব তাতেও নয়। আল্লাহ তা‘আলা নিজের সম্পর্কে যা কিছু বিবরণ দিয়েছেন তার অন্যতম এ কালাম। অতএব, আমাদের মহান রবের কালামের অনুরূপ কোনো কালাম নেই। যেমন, তাঁর মহান গুণাবলির অনুরূপ গুণাবলি নেই। একইভাবে আল্লাহ তা‘আলা সংশ্লিষ্ট সবকিছুরই কোনো নজির বা উপমা নেই।

পূর্বে যেমন আমি বলেছি এ গ্রন্থটি পেয়ে সালাফগণ মহা উৎফুল্ল হয়েছেন। এত অনুরাগ ও আবেগে তারা আপ্লুত হয়েছেন যে, এর তিলাওয়াত কিংবা অধ্যয়নে তারা পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। তাই তাদের অবস্থাদিতে, তাদের বিষয়াশয়ে ও তাদের সম্পর্কে যা উদ্ধৃত হয়েছে এবং সীরাত গ্রন্থগুলো তাদের কার্যাদির যা তুলে ধরেছে, তা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি এ মহান কিতাব নিয়ে তাদের আনন্দের সীমা ছিল না। এ বিষয়ে তাদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাদের হৃদয়ে সম্মানের সবটুকু জুড়ে ছিল এ মহাগ্রন্থ।

এখানে সালাফে সালেহ বলে প্রথমত বুঝানো হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামকে। তারাই এর অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তারাই সরাসরি এ কিতাবের পাঠ নিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকেই তাঁর রাসূলের সহচর হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হিসেবে তারাই ছিলেন বিশেষায়িত। হ্যাঁ, তারাই হলেন প্রথম স্তরের সালাফ।

মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের অব্যবহিত পরেই অবস্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের এ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যেমন, আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

"সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের লোকেরা। অতঃপর যারা তাদের অব্যবহিত পরে আসবে, এরপর যারা তাদের পরে আসবে"।[1]

সুতরাং তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীরাও সালাফে সালেহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারাও তাদের মধ্যে শামিল- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের সকল যুগের ওপর যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করেছেন। আর এ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কোনো স্থান বা কালের

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৫।

মধ্যে সীমিত নয়। বরং চিরকাল তার অবকাশ থাকবে। কেননা আল্লাহ জাল্লা শানুহূ মুহাজির ও আনসারীগণের উত্তম অনুসারীদের জন্যও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: 100]

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

তাই উম্মতের সালাফের অনুসরণ-অনুবর্তন আমাদের অন্তর্ভুক্ত করবে তাদের সূতোয়, আমাদের মিলিত

করবে তাদের দলে। যদিও আমরা তাদের যুগে তাদের সঙ্গী না হতে পারি। যদিও আমাদের অবস্থান হয় তাদের চেয়ে অনেক দূরে। বরং আমরাও তাদের ফযীলত ও মর্যাদায় শামিল হতে পারি যদি আমরা তাদের আমাল ও আখলাকে শরীক হই।

নিশ্চয় এ কুরআন যেমন আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেছেন- বর্ণনা হিসেবে তাঁর বর্ণনাই যথেষ্ট আর বিবরণ হিসেবে তাঁর বিবরণই যথার্থ- কেন নয়, তিনি তো মহা প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাতা। তাঁর কাছে কোনো গোপনই গোপন নয়। আর তাঁর কিতাবের বিবরণ প্রদানে সমগ্র সৃষ্টি কখনো তাঁর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না, যতই তারা জ্ঞানী হোক। তারা যত জনই একত্রিত হোক। নিজের কিতাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেন,

قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ۝١ [ق: 01]

“কাফ, মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের কসম।” [সূরা কাফ, আয়াত: ০১] আল্লাহ সুবহানুহূ ওয়াতা‘আলা এখানে

'মাজদ' বা মর্যাদা শব্দ ব্যক্ত করেছেন। আরবদের ভাষায় 'মাজদ' শব্দটি গুণাবলির পূর্ণতার ব্যাপ্তি ও সুবিস্তৃতি বুঝায়। তাই যা-ই তার গুণাবলির পূর্ণতায় ব্যাপকতা ধারণ করে তার জন্যই এ বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়। তার বেলায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব, 'মাজীদ' অর্থ সেই জিনিস যা বিশেষণে পূর্ণ, যার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণের ব্যপ্তি অন্তহীন। এমনকি তা সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত এবং অভীষ্ঠ মর্যাদায় স্থিত। কেন নয়, এটি তো রূহ। কেন নয়, এটি তো নূর। কেন নয়, এটি তো হিদায়াত। কেন নয়, এটি তো আত্মিক রোগের শিফা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الاسراء: 82]

"আর আমরা কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮২] আল্লাহ সুবহানুহূর বাণী ﴿مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾ শব্দ এখানে 'তাবঈ'য' বা 'কিছু' অর্থবোধক নয়। বরং তা এখানে

‘জিনস’ বা সমগ্রতাকে বুঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র কুরআনই মানুষের অন্তরের জন্য শিফাস্বরূপ। এটি যেমন ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য রোগের আরোগ্যের কারণ, তেমনি তা বস্তুত, মৌলিকভাবে ও প্রধানত আত্মার ব্যধিসমূহ থেকে, সংশয় ও প্রবৃত্তির বিবিধ রোগ থেকে আরোগ্য দান করে।

উম্মতের পূর্বসূরীরা এ কুরআনের প্রতি ছিলেন তীব্র মনোযোগী। তাদের এক ঝলক ঘটনাই আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিবে কুরআনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কত চমৎকার ছিল। এতে অবশ্য বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, পূর্বসূরীদের যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ করে আমাদের ললাট কুঞ্চিত হয়, তাদের যে অগ্রসরতা দেখে আমাদের নেত্রদ্বয় বিস্ফোরিত হয়, তা এ জন্য যে, তারা সেই মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন এবং সেই স্তরে পৌঁছেছিলেন- যেখানে তারা আল্লাহ জাল্লা ওয়াআ‘লার বাণী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনাকে পরিপূর্ণভাবে চিত্রিত করেছিলেন। তাই এ উম্মতই শ্রেষ্ঠ

উম্মত যাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের মঙ্গলের জন্য। তাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মুসহাফে কারীমের উভয় পাশ থেকে, এই প্রজ্ঞাময় কুরআনের সামনে থেকে। পাঠানো হয়েছে এই কুরআন এবং এর সুস্পষ্ট এ আয়াতগুলোর নির্দেশনার আলোকে। এই উম্মত সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে (যাতে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠﴾ [آل عمران : 110]

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের

কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।” [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১১০]

এ উম্মতকে এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য ও কুরআনের এ পন্থায়ই এদের বের করা হয়েছে। এর পরে আর সীরাত ও হাদীসগুলো এবং গ্রন্থ ও কিতাবগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীবৃন্দ ও তাদের অনুসারী তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের কুরআন মাজীদ কেন্দ্রিক উপহার দেওয়া বিস্ময়কর ঘটনায় অবাক হবার কিছু নেই।

কুরআন আযীমের সঙ্গে সাহাবীদের আচরণ ও তাদের সজীব অনুবর্তন সংক্রান্ত সীরাতের বিবরণের এক ঝলক অধ্যয়নও মানুষকে অভিভূত ও বিস্মিত না করে পারে না। যেমন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ জাল্লা শানুহূ নাযিল করলেন,

﴿لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤﴾ [البقرة : 184]

“আল্লাহর জন্যই যা রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা রয়েছে যমীনে। আর তোমরা যদি প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন কর, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নিবেন। অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আযাব দিবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৪]

এ আয়াতটি আমাদের অনেকেরই মুখস্থ। আমরা অনেকেই এ আয়াত পড়ে থাকি। কিন্তু আমরা অধিকাংশই এখানে এসে থমকে দাঁড়াই না। কারণ, আমরা কুরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের মন নিয়ে একে তিলাওয়াত করি না। বরং এর শব্দগুলো পাঠ করে তা থেকে নেকী অর্জনের অভিপ্রায়ে আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। এর মর্ম উপলব্ধির তাড়নায়

আমরা একে অধ্যয়ন করি না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যখন আল্লাহ জাল্লা শানুহূ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যাতে যাবতীয় মালিকানা আল্লাহর, আসমান ও যমীনের যাবতীয় কর্তৃত্ব মহান রবের এবং তিনি মানুষের অন্তরের কল্পনা ও হৃদয়ের অব্যক্ত কথারও হিসেব নিবেন (যদিও তা উচ্চারণ না করা হয় এবং কর্মে প্রতিফলিত না হয়) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এ আয়াত শুনলেন, তাদের জন্য বিষয়টি বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরর কাছে ছুটে এলেন। যেমন, সহীহাইনে বিবরণ দেওয়া হয়েছে: অতঃপর তারা এ আয়াতের বক্তব্যের ভারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, (ইতোপূর্বে) এমনসব আমল অর্পিত হয়েছে আমরা যার সামর্থ্য রাখি: সালাত, সিয়াম, জিহাদ, সাদাকা অর্থাৎ এসবই আমরা করতে পারি। কিন্তু আজ আমাদের ওপর এমন এক আয়াত নাযিল হলো যার সামর্থ্য আমরা রাখি না। তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিষ্টাচার শিখিয়ে, কুরআনকে কীভাবে গ্রহণ করতে, নিখিল জাহানের রবের কালামকে কীভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে হবে তা শিক্ষা দিয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন,

«أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».

"তোমরা কি চাইছো তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব দুই সম্প্রদায়ের মতো বলতে 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম'? তোমরা বল, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।"[2,3]

---

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯।

[3] মূল হাদীসটি এমন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

তখন তাদের মধ্যে রাদিয়াল্লাহু আনহুম কেউই বাদ রইলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ সবাই মাথা পেতে নিলেন এবং বলে উঠলেন, ‘আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার

---

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } قَالَ نَعَمْ { رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا } قَالَ نَعَمْ { رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } قَالَ نَعَمْ { وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } قَالَ نَعَمْ

দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।’ উপস্থিত সবাই যখন এটি পড়লেন, বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদের জিহ্বা এর অনুসরণ করল, বাক্যটি তারা উচ্চারণ করলেন, পড়লেন এবং একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন, তখন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ছাড় ঘোষিত হলো। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে অবকাশ ঘোষিত হলো, যিনি বলেছেন,

﴿مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡ﴾ [النساء : 147]

“যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন তাহলে তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ কী করবেন?” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৭]

অর্থাৎ তোমাদের ওপর বোঝা চাপানোর মাধ্যমে তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহর কী ফায়দা যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? তখন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতকে স্বস্তি প্রদান করা হলো। আল্লাহর কিতাবে এ উম্মতের সাফাই নাযিল হলো। রাসূলুল্লাহ বর্ণিত হলো সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তা'আলা বললেন,

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾ [البقرة : 286-285]

“রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যরে বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে

তা তার ওপরই বর্তাবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৫-২৮৬]

আমরা দেখলাম, এখানে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ছাড় এলো তাদের ঈমান প্রমাণিত হবার পর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আনীত বিষয় তারা কবুল করার পর। হাদীসে উল্লিখিত এ ঘটনা প্রমাণ করে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কুরআনকে এমন কোনো বস্তু হিসেবে গ্রহণ বা কবুল করতেন না যা শুধু তিলাওয়াত করা হয়, যা থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা হয় আর তাতে নিহিত মর্মগুলোর পরিচয় জানা যায়। তারা বরং এ কুরআন পড়তেন এ মনে করে যে তাদের সম্বোধন করেই এসব বলা হচ্ছে। এর মর্মগুলোয় তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ জন্যই বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই তারা এ কুরআন ও মহা সংবাদের কঠিন বিষয়গুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হতেন। হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আল্লাহর বাণীতে কঠিন, জটিল ও কঠোর বিষয় পেয়ে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবীদের ধর্ণা দেবার এটিই একমাত্র ও অদ্বিতীয় ঘটনা নয়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام : 82]

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করে নি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮২] [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮) এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যারা তাদের ঈমানকে যুলুম থেকে পবিত্র ও নিরাপদ রাখতে পেরেছেন তাদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী ﴿وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ﴾ অর্থ যারা তাদের ঈমানকে যুলুমের সঙ্গে মেলায় নি। ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾ তাদের জন্য রয়েছে

দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। কেননা আহলে ঈমান তথা ঈমানওয়াদের জন্য প্রমাণিত ও কাঙ্ক্ষিত হিদায়াত শুধু দুনিয়াতেই সীমিত নয়। বরং হিদায়াত দুনিয়া ও আখিরাতে। আর আখিরাতের হিদায়াত দুনিয়ার হিদায়াতের চেয়ে বড়। তবে তা কেবল তারই থাকবে যার থাকবে দুনিয়ার হিদায়াত। কারণ, আখিরাতের হিদায়াতের মাধ্যমেই সেই জটিল অবস্থানের বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ মিলবে যা যুবাদের পর্যন্ত বুড়ো বানিয়ে ছাড়বে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ ٢﴾ [الحج: 02]

“তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই কঠিন।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ০২]

ঐ দিন মানুষ এমন হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হবে যা দিয়ে তারা ঐ বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে আসবে, যা দিয়ে

তারা ঐ পা ফসকানো অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পাবে, যা দিয়ে তারা পুলসিরাত পাড়ি দিবে। কারণ, আল্লাহ যদি তাকে পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার হিদায়াত দান না করেন, তাহলে সে তা অতিক্রম করতে পারবে না। ঐ পুল সে পাড়ি দিতে সক্ষম হবে না যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়ে ধারালো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সামনে যখন আয়াতটি নাযিল হলো, তারা তখন চিন্তান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে এলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে আছে যে কোনো যুলুমে লিপ্ত হয় নি? আমাদের সবাই তো কম-বেশি যুলুমে লিপ্ত হয়েছে। আর এ আয়াতের ভাষ্য মতে হিদায়াত ও নিরাপত্তার লাভের একমাত্র পাথেয় এমন ঈমান যার সঙ্গে মানুষ কোনো যুলুমের স্পর্শ লাগায় নি। অতএব, নিরাপত্তা ও হিদায়াতের শর্ত হলো মানুষের কোনো যুলুমে লিপ্ত হওয়া চলবে না। সাহাবীরা এ

থেকে বুঝলেন, এটি বুঝি সূক্ষ্ম, ছোট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও বড় তথা শিরক সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অনুযোগ করলেন, যুলুম থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা তো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষই তো কম-বেশি যুলুম করে থাকে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বলেছেন,

«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

"প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাকারী।"[4] এবং আল্লাহ তা'আলাও যেমন এর আগে বলেছেন,

﴿وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ٧٢﴾ [الأحزاب: 72]

---

[4] তিরমিযী, হাদীস নং ২৪২৩; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, হাদীস নং ৩৫৩৫৭

“আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় যালিম, একান্তই অজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭২] মানুষ তখনই এর প্রমাণ দিয়েছে যখন তারা কুরআনকে বহন করেছে অথচ আসমান, যমীন ও পাহাড়-পর্বতও তা বহনে সম্মত হয় নি। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ٧٢﴾ [الأحزاب: 72]

“নিশ্চয় আমরা আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় যালিম, একান্তই অজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭২]

আর এ গুণটি মানুষের কোনো ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা মানব জাতি বা মানব সম্প্রদায়

নির্বিশেষের জন্য এ সম্বোধন। তাই তো তারা প্রত্যেকেই যুলুমকারী বা যালিম, প্রত্যেকেই অজ্ঞ-বর্বর। কোনো মানুষই আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহ সুবহানুহূর পক্ষ থেকে রাসূলগণ যা এনেছেন তার হিদায়াত ছাড়া এ বিশেষণ দু'টি থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম নয়।

সাহাবীগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াতের বক্তব্য নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানাতে এলেন; তাদের কষ্টের কথা ব্যক্ত করতে এলেন, তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, বিষয়টি তোমরা যেমন ভাবছ তেমন নয়। অর্থাৎ তোমরা যা ধারণা করেছো যুলুম বিষয়টি আয়াতে তেমন নয়। বরং এটি তা-ই লুকমান আলাইহিস সালাম তদীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে যার ইঙ্গিত করেছেন,

﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣﴾ [القمان: 72]

"প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শির্ক করো না; নিশ্চয় শির্ক হলো বড় যুলুম"। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩] অতএব,

আয়াতে যে যুলুমের কথা বলা হয়েছে তা হলো শির্ক। ব্যাস, বিষয়টি তখন সাহাবীদের জন্য সহজ হয়ে গেল।

কুরআনের সঙ্গে সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) শীতল সম্পর্ক ছিল না। তাদের সম্পর্ক ছিল বরং আমলের সম্পর্ক। তারা একে নিয়েছেন নিজেদের প্রতি সম্বোধন হিসেবে। ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ فأرعها سمعك يعني أصغ إليها وأعطها أذنك فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه».

“তুমি যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তাঁর কিতাবে বলতে শোন: ‘হে ঈমানদারগণ’ তখন তোমার কর্ণকে সজাগ করো। অর্থাৎ সে দিকে মনোযোগ দাও, কানকে উৎকর্ণ কর। কারণ তা কোনো কল্যাণ হবে যার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অথবা কোনো অকল্যাণ হবে যা থেকে তোমাকে বারণ করা হচ্ছে।”

এটি এ জন্য হয়েছে যে তারা কুরআনকে মানার এবং আমলের জন্য বরণ করে নিয়েছেন। এতে যা সম্বোধন করা হয়েছে তা প্রত্যেক শ্রোতার উদ্দেশে, প্রত্যেকের জন্যই যার কাছে পৌঁছেছে। এর সম্বোধিতরা কোনো অতীত জাতি নয়। আমাদের জন্য শুধু এর ভেতর যা শব্দ ও কালাম রয়েছে তার আমল করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনই বাকি রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর উত্তম নমুনা প্রদর্শন করেছেন এবং তারা আল্লাহর কিতাবের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।

এই দেখুন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তার তনয়া আয়েশাকে যিনার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহূ সূরা নূরের ‘ইফক’-এর ঘটনায় তার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তার নিষ্কলুষতার ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে দেখা গেল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি যারা অপবাদ আরোপ করেছিল, তার শুভ্র চরিত্রে যারা মলিনতার ছাপ দিতে চেয়েছিল তাদের অন্যতম মিসতাহ ইবন আছাছা। তিনি

ছিলেন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকটভাজনদের একজন। অভাবী ছিলেন তিনি। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। অতঃপর যখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সপ্রমাণ হয়ে গেল। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন শপথ করলেন, এ দুষ্কর্মের পর তিনি আর তাকে সাহায্য করবেন না। আল্লাহ জাল্লা শানুহূ তখন নাযিল করলেন,

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ﴾ [النور: 22]

“তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন?” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২২] আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরপর তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বেয়াদবীমূলক আচরণ হেতু মিসতাহের প্রতি তার দান-দাক্ষিণ্য বন্ধের প্রতিজ্ঞা থেকে সরে এলেন।

কুরআনের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আচরণ শুধু একদিক থেকে বা এক

দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নত ছিল না। নানা দিক থেকে তারা কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কে উম্মতকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এসবের মধ্যে রয়েছে তাদের কুরআন তিলাওয়াত। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এ কুরআনের তিলাওয়াতকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। তারা একে অপরকে পথে দেখা হলে কুরআন শিক্ষার নিয়তে বলতেন, আমাদের সঙ্গে বসুন আমরা কিছুক্ষণ ঈমান আনি। এ বলে একজন আরেকজনকে সূরা আসর পড়ে শোনাতেন। তারা যখন একসঙ্গে হতেন যেমন তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- একজন পড়তেন আর বাকিরা কুরআন শুনতেন। তাদের জীবন কুরআনের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাদের আত্মায়, ওঠাবসায়, আলোচনা ও উপদেশে মিশে গিয়েছিল কুরআন। প্রতিটি বিষয়ে কুরআন তাদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। তারা কুরআনের সঙ্গে একাত্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তারা এতে মনোযোগ ও আগ্রহ নিবদ্ধ করেছিলেন। এ নিয়ে তারা অন্য সব ব্যস্ততা রেখে ব্যস্ত হয়েছিলেন। এ জন্যই তারা কুরআন

অনুধাবনে তারা অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমলে তারা অন্য সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তারা জিহাদে। অন্যদের ছাপিয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ তাদের হাতে যেসব বিজয় রেখেছিলেন তাতে। এসবই ছিল কুরআনের প্রতি তাদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, একাত্বতা ও অধিক পাঠের ফসল।

সাহাবীগণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন তাদের বৈঠকে, তিলাওয়াত করতেন তারা সালাতে। আর তার কোনো সমস্যা নেই যে তার পথ চলায় কুরআনকে সঙ্গে রাখে। কুরআন তিলাওয়াত করে সে জীবনের সকল অনুষঙ্গে। শহীদ হওয়ার রাতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত রত ছিলেন। এমনকি তাকে যে শহীদ করেছে (আল্লাহর কাছে তার যা প্রাপ্য সে তা-ই পাবে) সে বলেছে, তিনি যখন শহীদ হন তার হাতে ধরা ছিল পবিত্র কুরআন।

সাহাবীদের পরে আমাদের পূর্বসূরী পুণ্যবান তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণও তাদের এ পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তারাও তাদের মতো তিলাওয়াতে ও কাজ-কর্মে কুরআনকেই পাথেয় হিসেবে ধারণ করেন। যেমন, উসমান ইবন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হাম্মাদ ইবন সালামার চেয়েও বড় আবেদ দেখেছি। কিন্তু তার চেয়ে কল্যাণপথ যাত্রায়, কুরআনের তিলাওয়াতে এবং আল্লাহর জন্য আমলে বড় আর কাউকে দেখিনি। এদিকে আরেকজন বলেন, আমি আবু সুহাইল ইবন যিয়াদ থেকে আর কাউকে তার উদ্যোগে এতোটা সক্রিয় দেখি নি। তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। সব সময় তিনি রাতের সালাতে এবং কুরআনের তিলাওয়াতে নিয়মিত ছিলেন। অধিক পড়ার কারণে কুরআন যেন তার চাক্ষুস বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। কুরআনের বিধি-বিধান পালনে, এ থেকে উপকৃত হওয়ার ফলে কুরআন যেন সর্বদা তাঁর চোখের সামনেই থাকত। ইমামু দারিল হিজরাহ মালেক ইবন আনাস এর বিবরণ দিতে গিয়ে একজন বলেন, মালেক

ইবন আনাসের বোনকে জিজ্ঞেস করা হলো, মালেক ইবন আনাস তার গৃহে কী নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন? আর কী নিয়ে কাজ করতেন? তিনি বলেন, মাসহাফ শরীফ এবং তিলাওয়াত। এই হলো ইমাম মালেক রহ.-এর গৃহস্থ ব্যস্ততা। মাসহাফ ও তিলাওয়াত। এ বিষয়ে রয়েছে অনেক আছার। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কোনো কোনো পূর্বসূরী এমনও ছিলেন যে তার শিষ্যরা যখন তার কাছে উপস্থিত হতেন, বিদায়কালে তিনি তাদের উপদেশ দিতেন তারা যেন তাদের পথ যাত্রায় একসাথে না চলেন। বরং প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে পথ চলেন। তিনি তাদের বলেন, তোমরা যখন আমার কাছ থেকে চলে যাবে, তখন তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যাতে তোমরা প্রত্যেকে তার পথে কুরআন পড়তে পড়তে যেতে পারো। অন্যথায় তোমরা একসাথে যদি চলো, তবে বিভিন্ন কথাবার্তায় কুরআন থেকে উদাসীন হয়ে পড়বে।

এমনই ছিলেন পূর্বসূরীরা কুরআনের তিলাওয়াতে, কুরআনের প্রতি নিমগ্নতায় এবং কুরআন তিলাওয়াতে

আগ্রহে। কিন্তু এ তিলাওয়াত শুধু শব্দের তিলাওয়াত ছিল না। কেননা আল্লাহ সুবহানুহূ ওয়াতা‘আলা তাঁর কিতাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীদের প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি এক শ্রেণির তিলাওয়াতকারীকে ভর্ৎসনাও করেছেন। যারা কুরআন পড়ে অথচ কুরআনের আদর্শ ও শিক্ষাগুলো অনুধাবন করে না। বনী ইসরাঈলের একটি দলের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨﴾ [البقرة: 78]

“আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৭৮]

অর্থাৎ শুধু সেই পঠন, যাতে আল্লাহর কিতাবের কোনো অনুধাবন নেই। আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই নেই শুধু তিলাওয়াত ছাড়া। তাদের কাছে এর মর্মের অনুধাবন,

উপলব্ধি বা অনুভব নেই। এ নিয়ে কোনো ভাবনাও নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে কুরআন আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এসব আয়াতের অন্যতম হলো আল্লাহর বাণী :

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩﴾ [ص: 29]

"আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা সদ, আয়াত: ২৯}

এ কিতাব যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং একে মুবারক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর কোনো পন্থায় এ কিতাবের বরকত লাভ হবে, কোনো উপায়ে এই কিতাবের কল্যাণ আহরণ করা যাবে তাও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,,

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ﴾ [ص: 29]

“আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে।” [সূরা সদ, আয়াত: ২৯]

অর্থাৎ এর দ্বারা যাতে তাদের চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হয়। আর এ কিতাব থেকে বরকত হাসিল করার এ ভিন্ন আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম অহীতেই রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ٣ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤﴾ [المزمل: 01-04]

“হে চাদর আবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর।” [সূরা আল-মুয্যাম্মিল,

আয়াত: ০১-০৪] অর্থাৎ এর পাঠে ইরসাল করুন এবং কুরআনকে তারতীলের সঙ্গে ধীরে ধীরে পড়ুন।

﴿إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا ۝٥﴾ [المزمل: 05]

“নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এক অতি ভারী বাণী নাযিল করছি।” [সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ০৫] আর তা হলো কুরআন। অতএব, কুরআন হলো ভারী কথা যা আত্মস্থ করার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا ۝٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ۝٦﴾ [المزمل: 05-06]

“নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি। নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।” [সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ০৫-০৬] তাঁকে তিনি রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেন,

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ۝٦ ﴾ [المزمل :06]

“নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।” অর্থাৎ এতে মুখের উচ্চারণে সঙ্গে আত্মার ভাবনা, চিন্তা, গবেষণা ও অনুসন্ধানও একাত্ব হবে। যেমন, তিনি বলেন,

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ۝٦﴾ [المزمل :06]

“নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।” [সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ০৬] আর ‘নাশিয়াতুল লাইল’-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: রাতের মুহূর্তসমূহ। এর ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে: রাতের আমল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্যবেক্ষণ উভয় মতকেই সমর্থন করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তো দিয়েছেনই, তা যেন হয় রাত্রিতে। কারণ, জিহ্বার সঙ্গে আত্মার সংযোগের ক্ষেত্রে এটিই

অধিক সহায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার এ নির্দেশ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমে আবূ হুযায়ফা ইবন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، وَآلَ عِمْرَانَ ، وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ سَأَلَ ، وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ اسْتَجَارَ».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এক রাকাতে সূরা আল-বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা আন-নিসা পড়েন। যে রহমতের আয়াতই তিনি অতিক্রম সেখানে প্রার্থনা করেন, আর যে আযাবের আয়াতই অতিক্রম তিনি তা থেকে পানাহ চান।”[5]

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবই এক রাতে এক রাকাতে পড়েছেন। আর তাঁর পড়া কি যেনতেন ছিল? সাধারণ পদ্য বা গদ্য পাঠের মতো ছিল? যার কোনো অর্থই বুঝা যায় না? যার কোনো

[5] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১০০৯।

লক্ষ্যই নেই? না, আল্লাহর শপথ। তাঁর তিলাওয়াত পদ্ধতির বিবরণ দিতে গিয়ে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ».

“যখন তিনি কোনো পড়তেন যাতে তাসবীহ থাকত, তিনি সুবহানাল্লাহ পড়তেন অথবা কোনো প্রার্থনা থাকলে তিনি প্রার্থনা করতেন কিংবা কোনো আশ্রয় প্রার্থনা থাকলে আশ্রয় চাইতেন।”[6]

এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াত। তিলাওয়াত ছিল চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-গবেষণার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পদ্য পাঠের মতো তিলাওয়াত ছিল না। যেমন ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুমিনের তিলাওয়াত কেমন হওয়া উচিত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯১।

«لاَ تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقْل وَلاَ تَهُذُّوهُ كَهَذِّ الشِّعْرِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلاَ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ».

"তোমরা একে (কুরআন) নষ্ট খেজুরের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ো না কিংবা কবিতার মতো গতিময় ছন্দেও পড়ো না। বরং এর যেখানে বিস্ময়ের কথা আছে সেখানে থামো এবং তা দিয়ে হৃদয়কে আন্দোলিত করো। আর সূরার সমাপ্তিতে পৌঁছা যেন তোমাদের কারো লক্ষ্য না হয়।"[7]

এ কুরআনে রয়েছে নানা আশ্চর্য ও নানা রহস্য। যা কেউ দ্রুত তিলাওয়াত করে কিংবা চিন্তা-ভাবনাহীনভাবে পড়ে উদ্ধার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে মনোযোগহীন পড়তে নিষেধ করেছেন। বারণ করেছেন এর হক না আদায় করে তিলাওয়াত করতে। যে কি-না এর বিস্ময়ের কাছে এসে থামে না। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও তাদের

[7] মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৮৭৩৩।

পরবর্তী মনীষীগণ কুরআনের একটি সূরা শিক্ষায় দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত বসতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সূরা আল-বাকারাহ শিক্ষা করেন আট বছরে। বলা হয়ে থাকে: তিনি সূরা আল-বাকারাহ শেখায় বারো বছর সময় ব্যয় করেন। যেমন বলেছেন আবূ আবদুর রহমান সুলামী, তাবেয়ীদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের থেকে যেমন উসমান, উবাই ইবন কা'ব প্রমুখের কাছে কুরআন শিখেছেন তারা বলেন, 'আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দশ আয়াত শিখে আর সামনে এগুতাম না, যাবত আমরা তাতে কী ইলম রয়েছে, কী আমল রয়েছে তা শিখতাম। ফলে আমরা কুরআন শিখেছি, ইলম শিখেছি এবং আমল শিখেছি।' এমনই করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كُنَّا إِذَا تَعَلَّمْنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ نُجَاوِزْهَا حَتَّى نَتَعَلَّمَ مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ " قَالُوا : " فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا».

"আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশ আয়াত শিখতাম, সেখান থেকে সামনে বাড়তাম না যাবৎ না এর মধ্যে যত বিধান আছে, মর্ম ও আমল আছে তা না শেখা হত।' তারা বলেন, 'তাইতো আমরা কুরআন শিখেছি এবং ইলম ও আমল উভয়ই শিখেছি।"[৪]

মালেক রহ. বলেন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বারো বছরে সূরা আল-বাকারাহ শিখেন। যখন তিনি সূরা আল-বাকারাহ খতম করেন, একটি উট জবাই করেন। আর এ সময় শুধু তিনি সূরাটি মুখস্ত করায় বা শাব্দিকভাবে আত্মস্থ করায় ব্যয় করেন নি। বরং ধারণা করা যায় তারা তো পরবর্তীদের চেয়ে দ্রুতই মুখস্ত

[৪] বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ১৪০১।

IslamHouse.com

করতে পারতেন। কিন্তু তারা এ আসমানী মহা বাণীতে তাদের জন্য কী বার্তা রয়েছে, কী মর্ম ও বিধান রয়েছে তা অনুধাবনে এ সময় ব্যয় করতেন। এ জন্যই তাদের কথা কম হত কিন্তু তা বরকতে বেশি হত। কারণ, তা তত্ত্ব, মর্ম, চিন্তা ও বিদগ্ধতার নির্যাস হত। পক্ষান্তরে পরবর্তীদের কথা পরিমাণে বেশি হত কিন্তু বরকতে হত কম।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের অনেকে একটি আয়াত পড়তে পড়তে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। এমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে, যেমন বর্ণনা করেছেন আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন,

«قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالآيَةُ : إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনকি তা বারবার আবৃত্তি

করতে করতে সকাল করে ফেললেন। আর সে আয়াতটি ছিল আল্লাহর বাণী:

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١٨﴾ [المائدة: 118]

“যদি তুমি তাদের আযাব দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে তো তুমিই প্রতাপশালী প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১১৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়তে পড়তে পুরো একটি রাতই অতিবাহিত করে দেন।”[9]

একদল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তামীম দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিচের আয়াতটি পড়তে থাকেন:

---

[9] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৫০।

﴿أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجۡعَلَهُمۡ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [الجاثية: 21]

“যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে এ সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে?’ [সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ২১] তিনি এ আয়াত আওড়াতে আওড়াতে সকাল হয়ে যায়। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও এমন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি পড়ছিলেন:

﴿فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٧﴾ [الطور: 27]

“অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন।” [সূরা আত-তূর, আয়াত: ২৭] তিনি এ আয়াতে এসে থেমে যান। এখানে এসে তিনি বারবার আওড়াতে থাকেন আর দো‘আ করতে থাকেন। এ ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে বিষয়টি অনেক দীর্ঘ মনে হলো। আমি তখন বাজারে গেলাম। সেখানে আমার যাবতীয় প্রয়োজন সারলাম। তারপর তাঁর কাছে

ফিরে এলাম। তিনি তখনো আয়াতটি আবৃত্তি করে যাচ্ছেন আর দো‘আ করে যাচ্ছেন। তারা এমন করেছিলেন আয়াতে চিন্তা করার জন্য। হরফ আদায় করে বেশি বেশি নেকী প্রাপ্তির ইচ্ছায় তারা এমন করেন নি। তা ছিল বরং আয়াতে নিহিত অর্থ ও মর্ম এবং তাতে লুকিত কল্যাণ আহরণের নিমিত্তে। বর্ণিত হয়েছে ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর এ বাণীটি আওড়াতে থাকেন:

﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ١١٤﴾ [طه: 114]

“হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৪] সাঈদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতটি বারবার পড়তেন :

﴿وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: 281]

“আর তোমরা সে দিনের ভয় কর, যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮১]

এভাবে একদল সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এমন বর্ণিত হয়েছে। আর আয়াতে এমন পুনরাবৃত্তি ফরয সালাতে অনুমোদিত নয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেন নি। তাঁর থেকে এমনটি প্রমাণিতও নয়। তিনি এমন করেছেন কেবল নফল সালাতগুলোয়। যেমনটি জানা যায় ইমাম নাসায়ী ও প্রমূখ বর্ণিত আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আছর থেকে। একই আয়াত বারবার পড়ার এই ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কুরআন নিয়ে চিন্তা করতেন। কারণ, বারবার এসব আয়াতের পঠন ও পুনরাবৃত্তি ছিল মূলত এর মর্ম ও তাৎপর্য নিয়ে চিন্তার খাতিরে। তেমনি সাহাবায়ে কেরাম এ মহাগ্রন্থ তিলাওয়াতকালে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। বলাবাহুল্য তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করতে দেখেছেন বলেই তাঁর অনুকরণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে আম্বিয়া কিরাম ও সাজদায় মস্তক অবনতকারী ইলমওয়ালাদের এবং এ কিতাবের উপদেশাবলি শ্রবণে

কান্নায় নুয়ে পড়াদের প্রশংসা করেছেন। একদল নবীর বিবরণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٖ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنۡ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبَيۡنَآۚ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَبُكِيّٗا۩ ٥٨﴾ [مريم: 58]

“এরাই সে সব নবী, আদম সন্তানের মধ্য থেকে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদের আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত এবং যাদেরকে আমরা পথপ্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ত।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৮]

এখানে আল্লাহর বাণী ﴿خَرُّوا﴾ শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করুন। এটি সুস্পষ্টভাবে সাজদায় অগ্রসরতার প্রমাণ দিচ্ছে। আর এসব হলো বিনয়, নম্রতা, আপন হীনতা

ও দীনতা প্রকাশের সাজদাহ ﴿خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً﴾।
এছাড়া আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবদের একটি দলের প্রশংসা করে বলেন,

﴿وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٨٣﴾ [المائدة: 83]

‘আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য জেনেছে। তারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন।’ [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৮৩]

এভাবে কুরআন পাঠকালে কান্নার জন্য আল্লাহর প্রশংসার আরও অনেক উপমা রয়েছে। এটি সেই গুণাবলির একটি আল্লাহ যার প্রশংসা করেছেন তা নবীগণ ও ইলমওয়ালাদের মধ্যে থাকায়, যারা এ কিতাব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং এ নিয়ে

আত্মমগ্ন হয়েছেন। এ জন্যই আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বোত্তম চরিত্রবান মনীষী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখি। যেমন, আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন,

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি সালাত আদায় করতে দেখেছি, তাঁর বক্ষ থেকে উনুনের ফুটন্ত পাতিলের মতো কান্নার আওয়াজ আসছে।"[10] কুরআনুল হাকীম নিয়ে চিন্তা ও তার প্রভাবেই তাঁর এ হৃদকম্পন ও ক্রন্দনের সৃষ্টি। একইভাবে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

[10] সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৯০৪; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৭৫৩।

থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

«اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ حَسْبُكَ الآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».

“আমাকে তুমি তিলাওয়াত করে শুনাও। বললাম, আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব অথচ আপনার ওপরই এটি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, ‘আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি’। অতপর আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শুনাতে লাগলাম। যখন আমি- ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ (অতএব, কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের ওপর সাক্ষীরূপে?)-এ পৌঁছলাম, তিনি বললেন, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে। তখন আমি তাঁর

দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে”।[11]

শুধু এ দুটিই নয়; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্নার এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। তিনি ছিলেন এ কুরআন শ্রবণে এবং কুরআনের হিকমতবহুল, শিক্ষা ও উপমবহুল আয়াত পাঠে অধিক ক্রন্দনকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীবৃন্দও তাঁর এ পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় একটি গৃহ নির্মাণ করেন। ঘরের পাশে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ। তিনি সেখানে সালাত আদায় করতেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সেখানে মুশরিকদের স্ত্রীরা জমায়েত হত। আর তাদের বাচ্চারা সমবেত হয়ে

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৩।

বিস্ময়ভরা চোখে তাঁকে দেখত। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অধিক ক্রন্দনকারী কোমলপ্রাণ মানুষ। কুরআন তিলাওয়াতকালে তিনি তাঁর অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। শুধু আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই এমন ছিলেন না, বরং উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি কঠোরতা ও শক্তিমত্তায় প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনিও কুরআন পাঠকালে কান্নায় নুয়ে পড়তেন। সাহাবীদের এক জীবনীকার বলেন, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা ফজরের জামা'আতে সালাত আদায় করেন। এতে তিনি সূরা ইউসুফ পড়তে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এমনকি তাঁর গণ্ডদেশ অশ্রুতে ভেসে যায়। আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি ইশার সালাতে এ সূরা পড়তেন। এটি প্রমাণ করে তিনি বারবার এ সূরা তিলাওয়াত করতেন আর বেশি বেশি কান্নাকাটি করতেন। আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন হাদ বলেন, আমি সকালের সালাতে শেষ কাতারে ছিলাম। সেখান থেকে উমার ইবনুল খাত্তাবের কান্না শুনতে পেলাম। সূরা ইউসুফের এ আয়াত পড়ে তিনি কেঁদে যাচ্ছেন :

﴿قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [يوسف: 86]

“সে বলল, ‘আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৬] কুরআন তিলাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া সংক্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তীদের অনেক বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানে পূর্বসূরীদের কুরআন পড়ে কান্নার পয়েন্টে এসে একটু দাঁড়ানো দরকার। আর তা এ কথা জানতে যে, কুরআন তিলাওয়াতে কান্নার দু’টি প্রকার রয়েছে: এক ঐ কান্না যা লৌকিকতা ছাড়া স্বতস্ফূর্তভাবে এসে থাকে। এটি আসে মূলত স্বভাবজাত প্রভাব থেকে। যা মানুষ চেষ্টা করে আনে না। এটি কুরআনের আয়াতসমূহের ভয় ও আশা অথবা আল্লাহ তা‘আলার বড়ত্ব ও মহত্বের বিবরণ পাঠে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সন্দেহ নেই এটি সে কান্না পুন্যবান পূর্বসূরীরা যাতে ভেঙ্গে পড়তেন। এটি হৃদয়ের সুস্থতা, কোমলতা ও সজীবতার প্রমাণ দেয়। কান্নার দ্বিতীয় প্রকার সেই কান্না যা কষ্ট করে আনতে হয়। তবে তা মানুষকে দেখানোর জন্য নয়। বরং আয়াতের

মর্ম অনুধাবন করে তাতে প্রভাবিত হওয়ার জন্য। এর নমুনা হলো উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাঁদতে দেখে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে বলুন কোন জিনিস আপনাকে ও আপনার সাথীকে কাঁদিয়েছে? তা শুনে যদি পারি আপনাদের সঙ্গে স্বতস্ফূর্তভাবে কাঁদব না পারলে কান্নার ভান করব। এখানে উদ্দেশ্য কৃত্রিম কান্না নয়। বরং উদ্দেশ্য কান্নার কারণ তালাশ করা যা সত্যিকার কান্নার উদ্রেক করবে যেমন করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর। এ কথাই প্রমাণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا».

"নিশ্চয় এ কুরআন নাযিল হয়েছে বিষণ্নতা নিয়ে। অতএব, তোমরা যখন তা পড়বে তখন কাঁদবে। যদি কাঁদতে না পারো তাহলে কান্নার কসরত চালাবে।"[12]

এই হাদীসটি কান্নার ভাণের বৈধতা প্রমাণ করে। তবে তা ঐ লৌকিক কান্না যাতে কৃত্রিমতা নেই। লোক দেখানো বা প্রশংসা লাভের সুপ্ত অভিলাষও নেই। এর লক্ষ্য শুধু আল্লাহর বাণী থেকে প্রভাবিত হতে চেষ্টা করা। যখন কোনো অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক কলবকে কান্না থেকে বাধা দেয় বা হৃদয় ও কান্নার মাঝে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তখন আমাদের কর্তব্য নিজেদের অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। যাতে তা লৌকিকতা ছাড়াই সরাসরি কুরআন থেকে প্রভাবিত হতে পারে।

---

[12] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৩৩৭; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, হাদীস নং ১৮৯১।

কুরআন পাঠকালে এই ভাবনা, এই পুনরাবৃত্তি ও এই কান্না ক্ষণিকের কোনো সীমিত কোনো আবেগ ছিল না, পাঠ পরবর্তী জীবনে যার কোনো প্রভাব বা ফলাফল পরিলক্ষিত হত না। বরং এ ছিল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সুদীর্ঘায়িত প্রভান্বিত হওয়ার অবস্থা, অব্যাহত প্রতিক্রিয়ার হালত। এ জন্যই তাদের আমলগুলো হত সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম ও কাঙ্ক্ষিত উপায়ে। কারণ, তারা এ প্রভাব থেকে তাদের জীবনের জন্য  সুফল অর্জন করেছিলেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের মানুষদের বাস্তব অবস্থা হলো, আপনি কিছু মানুষকে সালাতে কুরআন তিলাওয়াতকালে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে দেখবেন ঠিক। কিন্তু ঐ প্রভাব সে মসজিদের গণ্ডি অতিক্রম করে না, যেখানে সে প্রভাবিত হয়েছে এবং যেখানে সে আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। ফলে এ কান্নার কোনো প্রভাব তার আচরণে বা তার আখলাকে কিংবা তার গুনাহ বর্জনে বা তার নেকী অর্জনে পরিলক্ষিত হয় না। সন্দেহ নেই কুরআন থেকে প্রভাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং পবিত্র কালামের আলোয়

নিজেকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি ত্রুটি এবং এটি এক ধরনের সমস্যা। কুরআন অনুসরণকারী এবং একে আদর্শ হিসেবে গ্রহণকারীর কুরআনী বিবরণের সঙ্গে যা খাপ খায় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ١٢٣﴾ [طه: 123]

‘অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।’ [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১২৩]

অর্থাৎ সে তার আমলে বিপথগামী হবে না এবং ভবিষ্যতে কিংবা তার হাল-অবস্থায় দুর্ভাগা হবে না। সে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত এবং হতভাগ্য থেকে নিরাপদ। তাই কুরআনের পাঠক ও শ্রোতার উচিত এ কুরআন থেকে তার আচার-আচরণে ও আমল-আখলাকে

প্রভাবিত হওয়া। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذِ النَّاسُ نَائِمُونَ، وَبِنَهَارِهِ إِذِ النَّاسُ يَفْرُطُونَ، وَبِحُزْنِهِ إِذِ النَّاسُ فَرِحُونَ، وَبُبُكَائِهِ إِذِ النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وَبِصَمْتِهِ إِذِ النَّاسُ يَخْلِطُونَ، وَبِخُشُوعِهِ إِذِ النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ مَحْزُونًا، حَكِيمًا عَلِيمًا، «وَلاَ يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ جَافِيًا وَلاَ غَافِلاً، وَلاَ صَيَّاحًا حَدِيدًا».

“কুরআনের বাহকের উচিৎ (এখানে বাহক বলতে শুধু হাফেযগণই উদ্দেশ্য নন, বরং এর প্রতিটি বাহকেরই চাই তিনি যত অল্প অংশের বাহকই হোন না কেন) আপন রজনীকে চেনা যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, আপন দিবসকে চেনা যখন লোকেরা সীমালঙ্ঘন করে, আপন দুশ্চিন্তাকে চেনা যখন লোকেরা আনন্দে থাকে, আপন কান্নাকে চেনা যখন লোকেরা হাসে, আপন নীরবতাকে চেনা যখন লোকেরা মেলামেশা করে, আপন বিনয়কে চেনা যখন লোকেরা অহংকার করে।

কুরআনের বাহকের উচিৎ চিন্তান্বিত, প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী হওয়া। কুরআনের বাহকের উচিৎ নয় নির্দয়, উদাসীন কিংবা চিৎকারকারী বা লৌহকঠিন হওয়া।”[13] কুরআন পাঠকারীর ওপর কুরআনের সুপ্রভাব ও মহৎ ক্রিয়ার সম্পর্কে এমন আরও অনেক বাণী উদ্ধৃত করা যায়। এমন ব্যাখ্যা সম্বলিত একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে। যেমন, আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে কুরআনের বাহকগণ অথবা তিনি বলেছেন,

«يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اعْمَلُوا بِهِ فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ , وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ».

“হে ইলমের বাহকরা, তোমরা ইলম অনুযায়ী আমল করো। কারণ, সেই প্রকৃত আলেম যে জেনে সে

---

[13] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬৬৮; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, হাদীস নং ৩৬৭৩৪।

অনুযায়ী আমল করে এবং তার ইলম তার আমলের অনুরূপ হয়। অচিরেই এমন জাতিসমূহের আবির্ভাব ঘটবে যারা এলেমের বাহক হবে, কিন্তু তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না।”[14] অর্থাৎ তা তাদের মাথা অতিক্রম করবে না। তাদের গলা অতিক্রম করবে না। বরং তা শুধু তাদের মুখের বুলি। অন্তরে যার কোনো প্রভাব নেই। সন্দেহ নেই এই প্রতিবন্ধক এবং এই অন্তরায় তাদের কুরআন থেকে প্রভাবিত হওয়া বা উপকৃত হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের রোগ-শোকের উপশমে এবং তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়ের সমাধানকল্পে কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই তারা কুরআনের আয়াত নাযিলের প্রত্যাশায় থাকতেন, তা পর্যবেক্ষণ, তাকে মূল্যায়ন করতেন এবং তাদের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেবে কিংবা অনভিপ্রেত

---

[14] মুসনাদ দারেমী, হাদীস নং ৩৯৪।

কিছু উন্মোচিত হয়ে যাবে বা কারও ধ্বংসের কারণ হবে- এমন আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেহেতু কুরআন নাযিল সম্পর্কে এবং তার অনুসরণের ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকতেন। এ জন্য তাদের অবস্থা ছিল স্থির ও অবিচল।

যখন কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হত, সাহাবায়ে কেরাম তা পূর্বের বিবরণ মতো তা শিখতেন। অতঃপর আমল করতেন এবং যাবতীয় সৎ কাজের প্রতি ধাবিত হতেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের ভর্ৎসনা করতেন তারা ঘাবড়ে যেতেন। যেমন, আল্লাহ জাল্লা শানুহূ বলেন,

﴿أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ﴾ [الحديد: 16]

"যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয় নি ?" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১৬]

কুরআনে কোনো প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে তিরস্কার করা হলে তারা সন্ত্রস্ত হতেন। জলদি তারা নিজেদের ভুল শুধরে নিতেন। কোনো বিপদ বা বিপর্যয় নেমে এলে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন যেমন উহুদের যুদ্ধে ঘটেছিল। সাহাবীগণ উহুদ বিপর্যয়ের কারণ জানতে চাইলেন, ﴿أَنَّىٰ هَٰذَا﴾ আমাদের ওপর এ আপদ নেমে এলো কোত্থেকে? এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন,

﴿قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ﴾ [آل عمران: 165]

'বল, 'তা তোমাদের নিজদের থেকে''। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৫] এ কারণে সাহাবীদের জীবনে কুরআন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল অন্যদের জীবনের তুলনায়। এ জন্যই তারা অন্যদের থেকে সুস্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে গেছেন। মর্যাদায় কেউ তাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। কেউ পারবে না তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্পর্শ করতে। তবে হ্যাঁ, যারা তাদের সঠিকভাবে অনুসরণ করবে এবং তাদের অনুসৃত পথে চলবে, তারাও তাদের মত বা

তাদের কাছাকাছি মর্যাদা ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছেন কুরআনের পাঠ ও তিলাওয়াতে, কুরআন অনুযায়ী আমলে এবং তাকে জীবনপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণে। তাঁকে জীবনাদর্শ মানতে গিয়েই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়- কেমন ছিল তাঁর আখলাক-চরিত্র? প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও হকচকিত হন। জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? তিনি বললেন, জী। তিনি সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করে যা ছিল নববী পদ্ধতির সারকথা, তাঁর আদর্শ ও শিক্ষার সারসংক্ষেপ। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র ছিল হুবহু কুরআন। কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। নিজের দিবসে তা অনুযায়ী তিনি আমল করতেন। তা নিয়ে তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন। তিনি এতে অবিচল থাকতেন এবং আমল করতেন রাতের প্রহরগুলোয়,

দিনের মুহূর্তগুলোয়। কোনো মুহূর্তও তাঁর কুরআন ছাড়া কাটত না। বরং তিনি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে কুরআনের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং কুরআনের কথা ব্যাখ্যা করতেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমও এ পথে হেঁটেছেন। সর্বাবস্থায় তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত কুরআনের প্রতি- সব অবস্থায় এবং সব কাজে। এ জন্য যখন ইবন উোর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজের মাসআলাসমূহের একটি জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১] তারা যখন কাজগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি কাজের দলীল তলব করলেন, তিনি তাদের এ বলে জবাব দেন নি যে, তিনি তা করেছেন বা করেন নি। বরং তিনি তাদের সবচেয়ে বড় দলীলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করা প্রতিটি কাজ এবং তাঁর বলা কথাকেই সমর্থন করে। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

পুণ্যবান পূর্বসূরীদের কাছে কুরআনের মর্যাদা ছিল সব ইলমের আগে। এ জন্য তারা কুরআনের ব্যস্ততার সঙ্গে অন্য কোনো ব্যস্ততায় জড়াতেন না। এটা প্রমাণিত সত্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন সবার কাছে স্পষ্ট হওয়া, অন্যসব থেকে আলাদা হওয়া এবং অন্য সব থেকে তা সুরক্ষিত হওয়া অবধি হাদীস লিখতে বারণ করেছিলেন। বলা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময়ে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করেছিলেন যাতে অন্য সব থেকে কুরআন আলাদা হয়ে যায়। লোকেরা যাতে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু এমনকি তাঁর বাণী নিয়েও ব্যস্ত

না হয়ে পড়ে। সাহাবীগণও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাদের কাছে কুরআন ছিল প্রথম স্তরে। এমনকি তারা বলতেন, ‘আমাদের কেউ যখন সূরা আল-বাকারাহ মুখস্ত করে ফেলতেন আমাদের মাঝে তার মর্যাদা বেড়ে যেত।’ অর্থাৎ তার সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে যেত। তিনি এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতেন যা অন্যরা হত না। কেননা তা এমন সূরা যাতে রয়েছে অনেক বিধি-বিধান, যাতে রয়েছে রাব্বুল আলামীনের মহান গুণাবলি এবং কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদান আয়াত তথা আয়াতুল কুরসী। লক্ষণীয় হলো, সাহাবায়ে কেরাম কোনো কিছুকেই কুরআনের সমকক্ষ ভাবতেন না। অথচ এ যুগে ইলমে নিয়োজিত অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায় কুরআন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকতে। এ থেকে একেবারে বর্জন করার অর্থে বিমুখ নন তারা, বরং তালিবুল ইলমের অগ্রাধিকার বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাদের এ বিমুখতা। ইলম অর্জনে নিয়োজিত ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ে লিপ্ত হন তা হলো আল-কুরআনু আযীম। হোক তার তিলাওয়াত,

মুখস্তকরণ বা এর অর্থ ও মর্ম বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা এবং এ প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ সম্পর্কে আলেমদের বলা ভাণ্ডার নিয়ে লিপ্ত হওয়া।

সালাফে সালেহ বা পুন্যাত্মা পূর্বসূরীগণ এ পথই অবলম্বন করেছিলেন। তারা সবার ওপর কুরআনকে স্থান দিতেন। ইমামুল আইম্মাহ খ্যাত ইবন খুযাইমা কী বলেন তা শুনুন। তিনি উল্লেখ করেন, কুতাইবার কাছে ইলম শিক্ষার জন্য যেতে আমি আমার পিতার কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, প্রথমে তুমি কুরআন পড় যতদিন না আমি তোমাকে অনুমতি দিই। আমি কুরআন মুখস্ত করে ফেললাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা কর যাবৎ না তুমি খতমে সালাত পড় তথা আমাদের নিয়ে সালাতে কুরআন খতম কর। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম। যখন রমযান শেষ হয়ে গেল এবং তাদের নিয়ে আমি কুরআন খতম করলাম, তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি মারওয়ার উদ্দেশে এ মুহাদ্দিসের কাছে হাদীস শিক্ষার জন্য যাত্রা করলাম। মারওয়ায় অমুক অমুক থেকে হাদীস শুনলাম।

ইতোমধ্যেই আমার কাছে কুতাইবার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল। ফলে তিনি তাঁকে পেলেন না এবং তাঁর কাছে আর হাদীস শেখাও হলো না। এ ঘটনাই সাক্ষ্য দেয় সালাফ তথা পূর্বসূরী পুণ্যবান এবং তাদের পন্থী ও অনুসারীগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কুরআনকেই প্রথম স্তরে রাখতেন। আর বর্তমানে মানুষ কুরআন রেখে অন্য বিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সহায়ক নানা ইলমের পেছনে পড়ে গেছে। ফলে তারা তাফসীরের কিছুই জানে না, কুরআনের ইলমের এবং এতে যা আহকাম আছে তার কোনো অংশই জানে না। এমনকি বরং যারা কুরআনের তাফসীর নিয়ে মশগুল তারাও কুরআন থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবনের কিছু জানেন না। পবিত্র কুরআন তো নানা বিধি-বিধান ও প্রজ্ঞাময় বাণীতে ভরপুর। যা ইসতিম্বাত ও বিধান উদ্ভাবনের অপেক্ষা রাখে। যা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন হয়। আর গভীর দৃষ্টি, নিমগ্ন চিন্তা, আলেমদের বক্তব্য অধ্যয়ন এবং এ প্রজ্ঞাময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ সংক্রান্ত আহলে ইলমদের নানামুখী উক্তি ও ব্যাখ্যার সংকলন ছাড়া

কুরআন থেকে ইসতিম্বাত, তা অর্জন কিংবা জানা সম্ভব নয়। যাতে করে মানুষের কল্যাণ অর্জিত হয় এবং কুরআন বিষয়ে প্রাজ্ঞতা ও কুরআনে হাকীম সম্পর্কে পরিচয় লাভ হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সূক্ষ্ম মানদণ্ড ও সুস্পষ্ট নিক্তি দাঁড় করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে (নিজে) কুরআন শেখে এবং (অপরকে) শিক্ষা দেয়।”[15] পবিত্র কুরআন শেখা ও শেখানোর মর্যাদা সম্পর্কে এ সেই নবীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য যিনি মনগড়া কিছু বলেন না। এই উম্মতের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা কুরআন শিক্ষা করে। এখানে শিক্ষার অর্থ শুধু শব্দ শিক্ষা করা নয়, শব্দের

[15] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬৩৯; সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৪৫৪।

সঙ্গে তার অর্থ ও মর্ম শিক্ষা করা। সুতরাং কুরআনের প্রতি মানুষের ধাবিত হওয়া তার শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। ধাবিত হওয়ার ধরণ ও বৈশিষ্ট্য অনুপাতে নির্ধারিত হবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব, যে শুধু কুরআন হিফযের দিকে ধাবিত হবে তার জন্য এই চেষ্টা অনুপাতেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যে একে মুখস্থ করবে, এর অর্থ বুঝবে, একে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং এ থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করবে তার জন্য যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্যের মর্যাদা তার সমান নয়। যে মুখস্থ, অনুধাবন, গবেষণার পাশাপাশি আমলও করবে সে তো এমন মর্যাদায় উন্নীত যা কারও সমান নয়। এভাবেই ক্রমান্বয়ে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হবে। এক কথায় কুরআনের ইলম ও তার আমল অনুপাতেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে। অর্জন হারেই মর্যাদা প্রাপ্তি ঘটবে। যখন শিক্ষার স্তর পূর্ণ করে শেখানোর স্তরে উন্নীত হবে তখন তো সর্বোত্তম আমল কুরআনের শিক্ষাদানের মর্যাদাই হাসিল হবে। কারণ, এর দ্বারাই শরীয়ত সুরক্ষিত থাকবে। শুধু শব্দই শেখানো নয়

আমরা যেমন বললাম বরং শব্দের সঙ্গে মর্মও শেখানোর মাধ্যমে। মজার বিষয় হলো, আপনি যখন বিভিন্ন যুগের ইলম ও মানুষের উপকার অনুপাতে নানা স্তরের আলেমদের জীবনীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবেন তারা তাদের জীবনের পড়ন্তবেলায় এসে কুরআন নিয়ে লিপ্ত না থাকায়, কুরআনের ব্যস্ততায় ডুবে না থাকায় আফসোস করছেন। হায় তারা যদি কুরআনে আরও বেশি নজর দিতেন, আরও বেশি কুরআন পড়তেন, গবেষণা ও অনুসন্ধান করতেন এবং আরও অধিক সংকলন করতেন, যতটা অন্যরা করেন নি! আর তা এ জন্য যে তারা কুরআনে সুপ্রভাব, সুফল ও স্থায়ীত্ব খুঁজে পেয়েছেন। কারণ কুরআনে যত ইলম রয়েছে অন্য কোথাও নেই ততটা। কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহর এ বাণীই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

﴿بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ﴾ [العنكبوت: 49]

“বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট নিদর্শন।” [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৯] কাফেররা কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিদর্শন ও মু‘জিযা তলব করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তখন তাদের জবাব দিয়েছেন তাঁর বাণীতে:

﴿أَوَ لَمۡ يَكۡفِهِمۡ أَنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ [العنكبوت: 51]

“এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়?” [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৯] অতএব, কিতাব হলো নবীদের সবচেয়ে বড় নিদর্শন, সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ এবং সবচেয়ে বড় দলীল। তবে তা তাদের জন্যই দলীল, প্রমাণ ও নিদর্শন যারা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং তা গ্রহণ করে।

এ কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ কোনো জাতিকে সম্মানিত করেন আবার কোনো জাতিকে করেন

লাঞ্ছিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন। উম্মতের অবস্থার ক্ষেত্রে এ হাদীসের চেয়ে আর কোনো হাদীস এত সত্য ও এত বাস্তবতায় পর্যবসিত হয় নি। কুরআনকে ধারণ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের পূর্বসূরীদেরকে সম্মানিত করেছেন। ইলমে ও আমলে এবং শিক্ষা ও দাওয়াতসহ নানাভাবে আল-কুরআনুল হাকীম থেকে উপকৃত হবার ফলে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ যুগকে সম্মানিত করেছেন। আর এ শেষ যুগে এসে উম্মত নানা বিপদাপদ ও সমস্যায় জর্জরিত। আল্লাহর সাথে সম্পর্কে, সৃষ্টির সাথে সম্পর্কে এবং দীনের সাথে সম্পর্কে আখেরী যামানার এ উম্মতের প্রয়োজন এখন এ কিতাবের কাছে ফিরে আসা। যে কিতাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : كِتَابَ اللهِ».

“আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে পরবর্তীতে তোমরা পথহারা হবে না। আর তা হলো, আল্লাহর কিতাব (তথা কুরআন মাজীদ)।”[16]

অতএব, ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে সব মুসলিমের কর্তব্য এ পরিষ্কার সাহায্যকারীর কাছে ফিরে আসা। এই পরিষ্কার ঝর্ণার কাছে প্রত্যাবর্তন করা যার উপকার ফুরায় না, যার বিস্ময় শেষ হয় না, যার রহস্য ও মুক্তির পথ পুরনো হয় না। এ কিতাবের দিকে আমাদের এগিয়ে আসা উচিৎ যাতে রয়েছে নানা ঘটনা, উপদেশ ও শিক্ষা, আলো ও নূর। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা এর বিবরণে বলেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ﴾ [الشورى: 52]

---

16 সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫।

“অনুরূপভাবে (পূর্বে উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতিতে) আমরা তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে ‘রূহ’কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমরা একে আলো বানিয়েছি। যাদের মধ্যে আমরা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫২]

অতএব, এ কুরআন নূর ও রূহ। এগুলো এমন যা ব্যক্তির মধ্যে যেমন দলের মধ্যেও তেমন প্রাণ সঞ্চার করে। একইভাবে তা উম্মতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত করে। কারণ উম্মত যখন কিতাবের কাছে আসবে তখন তাকে এ দু’টি তথা নূর ও রূহ প্রদানের মাধ্যমে সুসংবাদ দেওয়া হবে। রূহের মাধ্যমে জীবন ফিরে পাবে আর নূরের মাধ্যমে হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ জানতে পারবে। অন্ধকারের ওই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসবে যা উম্মতকে ঘিরে ধরেছে এবং সর্বদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে। এ থেকে বেরুনোর কোনো পথ নেই সুস্পষ্ট কিতাব

ছাড়া এবং কুরআনে আযীম ছাড়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٖ مِّنۡهَاۚ﴾ [الأنعام: 122]

“যে ছিল মৃত, অতঃপর আমরা তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মতো যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের থেকে পারে না?” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২২]

আল্লাহর জাল্লা শানুহূর কাছে তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলির মাধ্যমে প্রার্থনা করছি, তিনি মুসলিমদের অবস্থা শুধরে দিন এবং আমাদেরকে আহলে কুরআন বানিয়ে দিন যারা আল্লাহর আহল ও তাঁর বিশেষ বান্দা। তারা আহলুল্লাহ তাঁর গুণাবলির মধ্যে অন্যতম সিফাতের প্রতি ধাবিত হবার কারণে আর তারা খাস তাদের মহা মর্যাদা ও কুরআনমুখীতার বদৌলতে। আল্লাহ কাছে প্রার্থনা তিনি আমাদেরকে তাদের মধ্যে শামিল করুন যারা কুরআন শিখেছে এবং অন্যদেরকে এর শিক্ষা দিয়েছেন।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ আরবী গ্রন্থের অনুবাদ। লেখক এতে পবিত্র কুরআনের সঙ্গে পূর্বসূরী নেককারদের শিক্ষণীয় ঘটনা এবং কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ তা তুলে ধরেছেন।